অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

আইটির যুগেও কম্পিউটারের ছাত্র নেই

বাংলাদেশে কম্পিউটার স্বাধীনতার পূর্বে প্রবেশ করলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে কম্পিউটারের ব্যাপক চর্চা শুরু হয় মোটামুটিভাবে ৯০-এর দশকে। আর জনমনে এই আগ্রহের দরুন আইটিকে সিরিয়াসলি পেশা হিসেবে নেবার আগ্রহ খুব বেশি দিনের নয়। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বছরে দশ হাজার প্রোগ্রামার তৈরির আহ্বান এবং ঐ একই বছরে একটি বিদেশী নামি আইটি এডুকেশন সেন্টারকে ফ্রেঞ্চাইজ হিসেবে আনার অনুমতি দেবার পরপরই মোটামুটি ব্যাপকভাবে দেশের তরুণ সমাজে ব্যাপারটি আলোড়ন তোলে। কেননা, এর আগে যারা তথ্যপ্রযুক্তি অঙ্গনে কাজ করতেন তাদের মধ্যে খুব সামান্যরই এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে।

ফলে ট্রেনিং নিয়েই আইটি অঙ্গনে একজন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এ ধারণা গড়ে ওঠে দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে। আর শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছাড়াই শুধু ট্রেনিং নিয়ে আইটিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে এই ধারণা করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারও সে সময় এসব বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এদেশে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেন দেদারসে। ফলে খুব অল্প সময়েই ব্যাঙের ছাতার মতোই গজিয়ে উঠতে থাকে আইটি এডুকেশন সেন্টার। বিদেশী নামি-দামি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশী উদ্যোক্তারাও খুলে বসেন ট্রেনিং সেন্টার। এদের মধ্যে অনেকগুলোই এক সময়ে কোচিং সেন্টার ছিল।

একটি অনুসন্ধানে দেখা গেছে কোচিং সেন্টারের ক্রেজের ঠিক পরপরই আইটি ট্রেনিং সেন্টারের ক্রেজটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। প্রমাণ এই পত্রিকারই পাতা। কয়েক বছর আগে এই পত্রিকার পাতা জুড়ে থাকত কোচিং সেন্টারের বিশালাকৃতির বিজ্ঞাপন। আর আইটি ট্রেনিংয়ের ক্রেস আসার পর সেই একটি পাতাগুলোয় ভরে উঠতে থাকে নানা সুন্দর সুন্দর প্রতিশ্রুতিপূর্ণ বাক্যে ভরা আইটি ট্রেনিং সেন্টারের বিজ্ঞাপন। অথচ আজকের এই পত্রিকাতে খুঁজলে কিন্তু সে আকৃতির কোনো বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে না। যদিও বা পাওয়া যেতে পারে তা হবে ক্ষুদ্র নেহায়েতই দায়সারা। কিন্তু কেন ? বিশ্ব কি আইটির যুগে নেই। সারা বিশ্বে যেখানে আইটির জয়জয়কার সেখানে আমাদের দেশে এ শিল্প অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো কেন ? আমাদের তরুণদের কি আইটি এডুকেশনের প্রয়োজন নেই !

যারা নিয়মিত এসব ট্রেনিং সেন্টারের কার্যক্রম লক্ষ করেছেন, তারা জানেন যে এদেশে বিদেশী আইটি ট্রেনিং সেন্টারগুলো যেমন দ্রুত গজিয়ে উঠেছে ততধিক দ্রুততায় সেগুলো গুটিয়েও গেছে। পেছনের কাহিনী চাঞ্চল্যকর। মূলত এসব ট্রেনিং সেন্টারগুলোর ব্যবসায়িক মানসিকতা। দেশী মালিকানাধীন কোম্পানির ব্যানারে চালিত বিদেশী ফ্রেঞ্চাইজ কোম্পানিগুলোর প্রবণতা ও ট্রেনিং দেবার দক্ষতা যাই হোক না কেন, এর নেপথ্যে দেশী ও বিদেশী উভয় কোম্পানিরই উদ্দেশ্য ছিল স্রেফ ব্যবসা করা। তাই মানের ব্যাপারে চরম উদাসীন থেকে বছর শেষে টার্নওভারের দিকেই তাদের দৃষ্টি ছিল বেশি। আর যারা আইটি সেন্টারগুলোকে দেশে এনেছেন তারা জাঁকজমকপূর্ণভাবে পাঁচতারা হোটেলে লাঞ্চিং অনুষ্ঠান, মন ভুলানো বিজ্ঞাপন আর গালভরা বুলি আওড়েছেন ঠিকই কিন্তু ব্যবসায় সামান্য টানাপড়েনেই ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছেন। এমনকি অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে বিদেশী একটি প্রতিষ্ঠান ৩-৪

মাসেই এদেশে ছেড়েছে। প্রথমদিকে শুরু হওয়া খুব কম সেন্টারই এখনও টিকে আছে। চলে যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে IIT, LCC, WINTECH, IBM, ACE, TULEC সহ অনেকেই রয়েছে। আবার অনেক সেন্টারই শাখা গুটিয়ে নিতেও শুরু করেছে।

অভিযোগ রয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠান চারভাবে ছাত্রদের সবচে' বেশি বিভ্রান্ত করে বিজ্ঞাপনের ভাষা, কোর্স, কারিকুলাম, কাউন্সিলিং ও মিথ্যা আশ্বাস। এরা বিজ্ঞাপনে যে ভাষা ব্যবহার করে, তাতে ভেবে বসা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এই কোর্সগুলো করলে কিংবা আইটি প্রফেশনাল হলে বুঝি খুব বড় একটা কিছু হয়ে যাওয়া যাবে দারুণ ভালো একটা চাকরি পাওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা এখনও ভিন্ন। এখনও আইটির বড় ধরনের কোনো সেক্টর গড়ে ওঠে নি। ফলে সে রকম কোনো চাকরিও নেই। এই পত্রিকার চাকরির বিজ্ঞাপনে চোখ বুলালেই এ কথার সত্যতা পাওয়া যাবে। এসব চাকরি আর সাধারণ কেরানির মধ্যে বেতনের পার্থক্য তেমন একটা নেই। আর কম্পিউটার জানলেই বাইরে চাকরি নিয়ে চলে যাওয়া যাবে এই ধারণাটিও ভুল। কেননা বাইরে চাকরি পেতে হলে জানার একটা গভীরতা থাকা লাগবে। এসব ট্রেনিং সেন্টারের কারিকুলাম যার সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এরা তাদের কোর্স কারিকুলামে ছয় মাসে যা শেখানোর দাবি করে তার কোনো একটি শিখতেই ২-৩ বছর সময় লাগা উচিত। ছয় মাসের একটি কোর্সে যখন লিনাক্স, জাভা প্রোগ্রামিং, মাইক্রোসফট সিকুয়েল সার্ভার ও এইচটিএমএল, এক্সএমএল, ইউএমএল শেখানো হয় তখন ভাবতে আতঙ্ক লাগে। এই প্রসঙ্গে একটি বেশ নামি ট্রেনিং সেন্টারের ফ্যাকাল্টি হেড জানালেন, আমরা আসলে শুধু ধরিয়ে দেই। শেখাটা সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব। কিন্তু ছয় মাসের এই ট্রেনিং শেষে প্রকৃতপক্ষে তারা কোনোটাই ভালো করে শিখতে পারে না। ফলে তারা সবই জানে কিন্তু ভাসা ভাসা। আর এই ভাসা ভাসা জানাটা তাদের কোনোই উপকারে আসে না।

এসব সেন্টার প্রথম যে প্রতারণাটি করে তার ছাত্রদের সাথে সেটি হলো কাউন্সিলিং নামে একটি ভাওতাবাজির মাধ্যমে। অনেকেই ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের একটি এপটিচুড টেস্ট নেয় যাতে আজ পর্যন্ত কেউ ফেল করেছে বলে শোনা যায় নি। মূলত এই পরীক্ষার মাধ্যমে তারা ছাত্রদের ভড়কে দেয় এই মর্মে যে, হয়তো সেখানে চান্স পাওয়া একটা বড় ব্যাপার। ফলে ছাত্রটা চান্স পেয়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে ভর্তি হয়েই যেতে হবে।

আর এভাবে যে ছেলে অংককে সারা জীবন ভয় পেয়ে এসেছে সে ভর্তি হয়ে গেল জাভা প্রোগ্রামিং কোর্সে কিংবা যে মেয়ে বাংলাদেশের পতাকার মাঝে সূর্যকে রং করেছিল বেগুনি সে ভর্তি হলো গ্রাফিক্স ডিজাইনিং কোর্সে। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটির জন্য ট্রেনিং সেন্টারগুলো লালন পালন করে কিছু কেতাদুরস্ত, স্মার্ট, চতুর ও সুন্দরী কাউন্সিলার। যাদের নিজেদেরই আইটি জ্ঞান এমএস ওয়ার্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ টেকনিক্যাল টার্মে ভরা কিছু মুখস্থ ইংরেজি বলে তারা ভড়কে দেয় ভর্তিচ্ছুদের। আর ট্রেনিং সেন্টারগুলো একটি ছাত্রের সাথে শেষ প্রতারণা করে কোর্স শেষে চাকরি দেবার কিংবা ইন্টার্নশিপ করাবার সময়। কোর্স শেষে ৬ মাস কিংবা ১ বছর বসিয়ে রেখে যে চাকরি তারা ছাত্রদের জন্য যোগাড় করে আনে তার বেতন অনেক সময়ই আড়তে খাতা লেখা কেরানির চেয়ে বেশি নয়। নামি একটি সেন্টার থেকে পাস করে বর্তমানে একটি বিদেশী এজেন্সিতে কর্মরত এক তরুণ জানালেন, আমি তিন বছরের কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম একটি সেন্টারে যার শেষ বর্ষটি ছিল ইন্টার্নশিপ। কিন্তু প্রায় ১ বছর বসিয়ে রেখেও ওরা আমাকে কোনো চাকরি দিতে পারল না। ফলে শেষ বর্ষ না করায় সার্টিফিকেটও পাই নি। অথচ আমি ওদের সব পরীক্ষায় এ গ্রেড পেয়েছি। এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করে একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করতাম। কিন্তু ওদের সেন্টারের পড়ায় মন বসানোর জন্য চাকরিটা ছেড়ে দেই। অথচ ওরা আমাকে যে চাকরিগুলো অফার করে তার বেতন আমার আগের চাকরির চেয়েও কম। এত বড় প্রতারণার খবর লোকে জানছে। আর জানছে বলেই সেন্টারগুলোর এই দৈন্যদশা।

শুধুই কি ট্রেনিং সেন্টারের দোষ ?

এক চেটিয়াভাবে ট্রেনিং সেন্টারগুলোকে দোষারোপ করাটাও ঠিক নয়। কেননা, আমাদের সরকার থেকে শুরু করে, যেসব ছাত্ররা এসব সেন্টারে পড়তে আসে তাদের অভিভাবকদেরও দোষ রয়েছে এ ব্যাপারে। আমাদের দেশে সরকার এখন পর্যন্ত কোনো স্ট্যান্ডার্ড কোর্স কারিকুলাম কিংবা স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং পদ্ধতির প্রচলন করতে পারে নি। পারে নি শিক্ষার্থীদের টাকার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে। ফলশ্রুতিতে এখন দেশের এই নামি-দামি প্রতিষ্ঠানগুলো হারাচ্ছে ছাত্র-আর সেই সাথে সুনাম। প্রতিবছর এইসব ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হচ্ছে। আর দেশ পাচ্ছে কিছু শিক্ষিত অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অদক্ষ বেকার কিছু আইটি প্রফেশনাল। একইভাবে শিক্ষার্থীদের অভিভাবককেও সচেতন হতে হবে। লাখখানেক টাকা দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে ভর্তি করানোর আগে সেসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষকদের সাথে আলাপ করতে হবে।

আর এই মন্দাভাব কাটানোর জন্য উদ্যোগ নিতে হবে আইটি ট্রেনিং সেন্টারগুলোকেই। তাদেরকে তাদের প্রতিকূলতা আর ব্যর্থতা দূর করে ব্যবসায়িক মনোভাব ত্যাগ করে শিক্ষার্থীদের পক্ষে কাজ করতে হবে। মিথ্যা কথা আর প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে সত্য চিত্রটি তুলে ধরতে হবে শিক্ষার্থীদের সামনে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মান যাচাই করে তার জন্য উপযুক্ত কোর্স নির্বাচনেও সাহায্য করতে হবে। আর ব্যবস্থা করতে হবে ইন্টার্নি বা প্রাকটিক্যাল ফিল্ডে কাজের ব্যবস্থা। একই সঙ্গে সিলেবাস ও কোর্স কারিকুলামকেও করতে হবে বাস্তবসম্মত। আর তাহলেই এই মন্দা কেটে যেতে পারে, আর তাতে উপকার হবে শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ গোটা দেশে।

■ মোঃ মারুফ হোসেন